একক ৬৭ ❑ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ টোপ

গঠন

৬৭.১ উদ্দেশ্য

৬৭.২ প্রস্তাবনা

৬৭.৩ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

৬৭.৪ মূলপাঠ ঃ টোপ

৬৭.৫ সারাংশ

৬৭.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

৬৭.৭ অনুশীলনী

৬৭.৮ উত্তরমালা

৬৭.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৬৭.১ উদ্দেশ্য

প্রতিভাধর কথা সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প পাঠকচিত্তকে চকিত ও বিস্মিত করে। তাঁর প্রতিভার দীপ্তি ন(ত্রের দ্যুতির মত ভাস্বর। কাহিনী, বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা ও রসবৈচিত্র্যে তার গল্পে অসামান্য কৃতির স্বা(র আছে। তাঁর রচনার পরিবেশ ও পটভূমি — তরাই-ডুয়ার্সের শ্যামল বনানী, নিম্নবঙ্গের নদী মোহানা, নোনামাটির চরে নতুন গড়ে ওঠা উপনিবেশ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। পদ্মা-মেঘনা, আত্রাই-মহানন্দা, সম্রাট-শ্রেষ্ঠী সবই তাঁর গল্পে স্থান অধিকার করে আছে।

'টোপ' গল্পে রামগঙ্গা স্টেটের রাজা বাহাদুর নিজে শিকারীর গৌরব প্রতিস্ঠায় আদিম হিংস্রতায় মানব-শিশুকে টোপ দিয়ে বাঘ শিকারেও পরাঙ্মুখ নন। গল্পের এই বিষয়বস্তু উপস্থাপনের দ(তায়, সমস্ত মনপ্রাণকে ভয়াল ভয়ঙ্কর এক অনুভূতিতে আলোড়িত করে। এমন নৃশংস গল্প বাংলা সাহিত্যে বিরল। গল্পটি পড়ে আপনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিষয়-ভাবনা ও রূপসৃষ্টির অভাবনীয় কৃতির যে পরিচয় পাবেন তা হ'ল —

১) একদিকে প্রকৃতির অপরূপ লাবণ্য অপরদিকে এক আদিম আরণ্যক পরিবেষ্টনীর পরিচয় উভয় ((ত্রেই লেখকের সমান দ(তা।

২) গল্পটিতে দুটি ভিন্ন শ্রেণী চরিত্রের পরিচয় আছে, যথা — এক গল্প কথকের — তাঁর চরিত্রের মধ্যে মধ্যবিত্ত সুলভ দোলাচল চিত্তবৃত্তি অত্যন্ত প্রকট। অপর চরিত্রটি বনেদী, অভিজাত বংশীয় রাজাবাহাদুর — যিনি মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী প্রতাপের দম্ভে বুঁদ তাঁর নৃশংস দানবমূর্তি টোপ-এর কাহিনীতে উঠে এসেছে ল(্য করতে পারবেন।

৩) লেখক গল্পটিতে হিউমার এবং স্যাটায়ারের ঠাস বুনুনিতে একটি নক্‌শা ধীরে ধীরে ফুটিয়েছেন। রচনার ভাষায় গদ্য কবিতার স্পন্দন পাওয়া যায়।

৬৭.২ প্রস্তাবনা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্প টোপ। এই গল্পটি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনাপর্বেই যথেষ্ট খ্যাতি এনে দেওয়ায়, তিনি অনতিবিলম্বে গল্পকার হিসেবে মান্য ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'টোপ' — বিষয়-ভাবনা ও রোমাঞ্চকর ঘটনার চমৎকারিত্বে সকলকে আকৃষ্ট করেছে। এ গল্পের কাহিনী উপস্থাপনায় গল্পের কথক, শিকার-বিলাসী রাজা-বাহাদুর ও গহন গভীর অরণ্যের ভয়াল পরিবেশ একটি অদৃশ্য সূত্রে আবদ্ধ। কাহিনীটি বিশেষ বড় না হলেও, ঘটনার অভাবনীয়তায় ও বর্ণনায় সৌকর্যে সংহত ও দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ পেয়েছে।

টোপ গল্পের নাম ব্যঞ্জনাধর্মী ও সবিশেষ মর্মান্তিক। রাজা বাহাদুরের শখ হোল শিকার। আর সে শিকারের জন্য, ছাগশিশু নয়, একটি জীবন্ত মানব-শিশুকে ব্যবহার করার মধ্যে যে অ-মানবিক নিষ্ঠুর মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা ভয়ঙ্কর। বাঘ শিকারের জন্য এই হিংস্রতম আয়োজন কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পে(সম্ভব কিনা তা ভাববার বিষয়। কিন্তু সত্য অনেক সময় কল্পনার চেয়েও অদ্ভুত হয়।

গল্পটিতে লেখক মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রাজা-বাদ্‌শা-জমিদারদের বিকৃত খেয়ালি চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। আরণ্য পরিবেশ ও ভাবমণ্ডল সৃষ্টিতে যে বর্ণনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা অসাধারণ শিল্পপ্রতিভার স্বা(র। গল্পটি লেখকের অসাধারণ শক্তি(মত্তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৬৭.৩ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁর ছোটগল্প কথা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) 'নারায়ণ' নামে প্রখ্যাত হলেও তাঁর প্রকৃত নাম ছিল তারকনাথ। ঐ নামে পূর্বসূরী এক বিশিস্ট কথা সাহিত্যিক ছিলেন বলে ('স্বর্ণলতা' গ্রন্থের রচয়িতা), পোশাকী নামটির পরিবর্তে এই নামেই তিনি লিখতে শু(করেন ছাত্র বয়স থেকেই। পরিণত বয়সে 'সুনন্দ' এই ছদ্মনামেও তিনি 'দেশ' পত্রিকায় নিয়মিত একটি কলাম লিখেছেন বহুদিন ধরে। জন্ম দিনাজপুরের বালিয়াডাঙিতে। আদি বাস বরিশালে। পুলিশ অফিসার বাবা প্রমথনাথের বদলির চাকরির সূত্রে বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছে নারায়ণকে তাঁর অল্পবয়সে। দারোগা হওয়া সত্ত্বেও প্রমথনাথ ছিলেন অত্যন্ত সাহিত্যপ্রেমী মানুষ. এই পারিবারিক পরিপ্রে(তেই নারায়ণও সাহিত্যানুরাগী হয়ে উঠেছিলেন বাল্যকাল থেকেই। তারই পরিণতি, সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হওয়া।

কলকাতা বি(েবিদ্যালয় থেকে রেকর্ড নম্বর পেয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজ এবং কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার পর কলকাতা বি(েবিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং বাকি জীবন সেই কাজেই অতিবাহিত করেন। অধ্যাপক হিসেবে তাঁর মনীষা এবং বক্ত(া হিসেবে তাঁর বাচনরীতি প্রায় প্রবাদককল্প হয়ে উঠেছিল ছাত্রমহলে। কলকাতা বি(েবিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. উপাধিও অর্জন করেন তিনি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবন কাটে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে। এই সূত্রে তিনি বাংলার নিম্ন ও উত্তরবঙ্গের নদনদী, পল্লীজনপদ, চা-বাগান ও আরণ্যক প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। তাঁর গল্পে উপন্যাসে এর প্রতিফলন আছে। সৃষ্টিশীল সাহিত্য ে(ত্রে তিনি প্রতিভায় যেমন স্বা(র রেখেছেন, তেমনি সমালোচক ও সাংবাদিক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছল। 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় তিনি ছদ্মনামে 'সুনন্দর জার্নাল' লিখতেন।

স্কুলছাত্র-থাকা অবস্থাতেই সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। সারাজীবনে প্রায় পনেরো-ষোলোটি উপন্যাস এবং তেরোটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন। মোট গল্পের সংখ্যা একশ উনিশটি। এগারো খণ্ডে তাঁর রচনাবলী পরবর্তীকালে সংকলিত হয়েছে। ছোটদের লেখাতেও তাঁর খ্যাতি সুপ্রচুর। তাঁর রূপায়িত টেনিদা অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং টাইপ চরিণত্র, বিশেষ করে কিশোর পাঠকদের কাছে।

বিখ্যাত উপন্যাস হল এইগুলি — 'উপনিবেশ'('পদসঞ্চার'('বিদূষক'('অমাবস্যা'র গান'('কাচের দরজা' আর গল্প সংকলনের মধ্যে 'বীতংস', 'কালাবদর', 'গন্ধরাজ', 'ছায়াতরী', 'বনজ্যোৎস্না' অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। এই 'টোপ' গল্পটি 'কালাবদর' সংকলনের অন্তর্গত। তাঁর লেখার মূল উপজীব্যগুলি হল ইতিহাস চেতনা, সমাজভাবনা, ব্যক্তি(মানুষের মনোবি(-ষণ। সরস অথচ ঋজু গদ্যশৈলী তাঁর রচনাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে বলে সমালোচকরা মনে করেছেন।

৬৭.৪ মূলপাঠ ঃ টোপ

সকালে একটা পার্সেল এসে পৌঁছেছে। খুলে দেখি একজোড়া জুতো।

না, শত্রুপ(র কাজ নয়। একজোড়া পুরোনো ছেঁড়া জুতো পাঠিয়ে আমার সঙ্গে রসিকতার চেষ্টাও করেনি কেউ। চমৎকার ঝকঝকে বাঘের চামড়ার নতুন চটি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, পায়ে দিতে লজ্জা বোধ হয় দস্তুরমতো। ইচ্ছে করে বিছানায় শুইয়ে রাখি।

কিন্তু জুতোজোড়া পাঠাল কে? কোথাও অর্ডার দিয়েছিলাম বলেও তো মনে পড়ছে না। আর বন্ধুদের সব কটাকেই তো চিনি, বিনামূল্যে এমন একজোড়া জুতো পাঠাবার মতো দরাজ মেজাজ এবং ট্যাক কারো আছে বলেও জানি না। তাহলে ব্যাপারটা কি?

খুব আশ্চর্য হব কিনা ভাবছি, এমন সময়, একখানা সবুজ রঙের কার্ড চোখে পড়ল। উইথ্ বেস্ট্ কমপ্লি-মেন্টস্ অব রাজাবাহাদুর এন আর চৌধুরী, রামগঙ্গা এস্টেট্।

আর তখনি মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল আট মাস আগেকার এক আরণ্যক ইতিহাস, একটি বিচিত্র শিকারকাহিনী।

রাজাবাহাদুরের সঙ্গে আলাপের ইতিহাসটা ঘোলাটে, সূত্রগুলো এলোমেলো। যতদূর মনে হয়, আমার এক সহপাঠী তাঁর এস্টেটে চাকরি করত। তারই যোগাযোগে রাজাবাহাদুরের এক জন্মবাসরে আমি একটা কাব্য-সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলাম। ঈ(রের গুপ্তের অনুপ্রাস চুরি করে যে প্রশস্তি রচনা করেছিলাম তার দুটো একটা লাইন এই রকম ঃ

ত্রিভুবন প্রভা কর ওহে প্রভাকর,
গুণবান্ মহীয়ান্ হে রাজেন্দ্রবর।
ভূতলে অতুল কীর্তি রামচন্দ্র সম—
অরাতিদমন ওহে তুমি নি(মপ।

কাব্যচর্চার ফলাফল হল একেবারে নগদ নগদ। পড়েছি — আকবরের সভাসদ আবদুর রহিম খানখানান

হিন্দী কবি গঙ্গের চার লাইন কবিতা শুনে চার ল(টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। দেখলাম যে নবাবী মেজাজের ঐতিহ্যটা গুণমান মহীয়ান অরাতিদমন মহারাজ এখানো বজায় রেখেছেন। আমার মতো দীনাতিদীনের ওপরেও রাজদৃষ্টি পড়ল, তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, প্রায়ই চা খাওয়াতে লাগলেন, তারপর সামান্য একটা উপল(্য করে দামী একটা সোনার হাতঘড়ি উপহার দিয়ে বসলেন এক সময়ে। সেই থেকে রাজাবাহাদুর সম্পর্কে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে আছি আমি। নিছক কবিতা মেলাবার জন্যে যে বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছিলাম, এখন সেগুলোকেই মন প্রাণ দিয়ে বি(্বাস করতে শু(করেছি।

রাজাবাহদুরকে আমি শ্রদ্ধা করি। আর গুণগ্রাহী লোককে শ্রদ্ধা করাই তো স্বাভাবিক। বন্ধুরা বলে, মোসাহেব। কিন্তু আমি জানি ওটা নছক গায়ের জ্বালা, আমার সৌভাগ্যে ওদের ঈর্ষা। তা আমি পরোয়া করি না। নৌকো বাধতে হলে বড় গাছ দেখে বাঁধাই ভালো, অন্তত ছোটখাটো ঝড়-ঝাপটার আঘাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

তাই মাস আষ্টেক আগে রাজাবাহাদুর যখন শিকারে তাঁর সহযাত্রী হওয়ার জন্যে আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন, তখন তা অঅমি ঠেলতে পারলাম না। কলকাতার সমস্ত কাজকর্ম ফেলে উর্ধ্ব(্বাসে বেরিয়ে পড়া গেল। তাছাড়া গোরা সৈন্যদের মাঝে মাঝে রাইফেল উঁচিয়ে শকুন মারতে দেখা ছাড়া শিকার সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণাই নেই আমার। সেদিক থেকেও মনের ভেতরে গভীর এবং নিবিড় একটা প্রলোভন ছিল।

জঙ্গলের ভেতর ছোট একটা রেললাইনে আরো ছোট একটা স্টেশনে গাড়ি থামল। নামবার সঙ্গে সঙ্গে সোনালী তকমা আঁটা ঝকঝকে পোশাক পরা আর্দালি এসে সেলাম দিল আমাকে। বললে — হুজুর, চলুন।

স্টেশনের বাইরে মেটে রাস্তায় দেখি মস্ত একখানা গাড়ি — যার পুরো নাম রোলস্ রয়েস, সং(পে যাকে বলে 'রোজ'। তা 'রোজ'ই বটে। মাটিতে চলল, না রাজ হাঁসের মতো হাওয়ায় ভেসে গেল সেটা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলাম না। চামড়ার খট্‌খটে গদী নয়, লাল মখমলের কুশন। হেলান দিতে সংকোচ হয়, পাছে মাথা সস্তা নারকেল তেলের দাগ ধরে যায়। আর বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় — সমস্ত পৃথিবীটা চাকার নিচে মাটির ডেলার মতো গুঁড়িয়ে যাক — আমি এখানে সুখে এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারি।

হাঁসের মতো ভেসে চলল 'রোজ'। মেটে রাস্তায় চলেছে অথচ এতটুকু ঝাঁকুনি নেই। ইচ্ছে হল একবার ঘাড় বার করে দেখি গাড়িটা ঠিক মাটি দিয়েই চলেছে, না দুহাত ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ওর চাকাগুলো।

পথের দুপাশে তখন নতুন একটা জগতের ছবি। সবুজ শালবনের আড়ালে আড়ালে চা-বাগানের বিস্তার, চকচকে উজ্জ্বল পাতার শান্ত, শ্যামল সমুদ্র। দূরে আকাশের গায়ে কালো পাহাড়ের রেখা।

ত্র(মশ চা-বাগান শেষ হয়ে এল, পথের দুপাশে ঘন হয়ে দেখা দিতে লাগল অবিচ্ছিন্ন শালবন। একজন আর্দালি জানাল, হুজুর, ফরেস্ট এসে পড়েছে।

ফরেস্টই বটে! পথের ওপর থেকে সূর্যের আলো সরে গেছে, এখন শুধু শান্ত আর বিষণ্ণ ছায়া। রাত্রির শিশির এখনও ভিজিয়ে রেখেছে পথটাকে। 'রোজে'র নিঃশব্দ চাকার নিচে মড়মড় করে সাড়া তুলছে শুকনো শালের পাতা। বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মতো শালের ফুল ঝরে পড়ছে পথের পাশে, উড়ে আসছে গায়ে। কোথা থেকে চকিতের জন্যে ময়ূরের তী(চীৎকার ভেসে এল। দুপাশে নিবিড় শালের বন, কোথাও কোথাও ভেতর দিয়ে খানিকটা খানিকটা দৃষ্টি চলে, কখনো কখনো বুনো ঝোপে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে এক এক টুকরো

কাঠের গায়ে লেখা ১৯৩৫, ১৯৪০। মানুষ বনকে শুধু উচ্ছন্ন করতে চায় না, তাকে বাড়াতে চায়। এইসব প-টে বিভিন্ন সময়ে নতুন করে শালের চারা রোপণ করা হয়েছে, এ তারই নির্দেশ।

বনের রূপ দেখতে দেখতে চলেছি। মাঝে মাঝে ভয়ও যে না করছিল এমন নয়। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ যদি গাড়ির এঞ্জিন খারাপ হয়ে যায়, আর তাকে বুঝে যদি লাফ মারে একটা বুনো জানোয়ার তা হলে ঃ

তা হলে পকেটের ফাউন্টেন পেনটা ছাড়া আত্মর(ার আর কোন অস্ত্রই সঙ্গে নেই।

শেষটায় আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসলাম — হাঁরে, এখানে বাঘ আছে?

ওরা অনুকম্পার হাসি হাসল।

— হাঁ, হুজুর।

— ভালুক?

রাজা-রাজড়ার সহবৎ, কাজেই যতটুকু জিজ্ঞাসা করব ঠিক ততটুকুই উত্তর। ওরা বলল — হাঁ হুজুর।

— অজগর সাপ?

জী মালিক।

প্র্ন করবার উৎসাহ ওই পর্যন্তই এসে থেমে গেল আমার। যে রকম দ্রুত উত্তর দিয়ে যাচ্ছে তাতে কোনো প্র্নেই যে 'না' বলে আমাকে আ্বস্ত করবে এমন তো মনে হচ্ছে না। যতদূর মনে হচ্ছিল গরিলা, হিপোপোটেমাস, ভ্যাম্পায়ার কোনো কিছুই বাকি নেই এখানে। জুলু কিংবা ফিলিপিনোরও এখানে বিষাক্ত(ব্যুমেরাং বাগিয়ে আছে কিনা এবং মানুষ পেলে তার বেগুণপোড়া করে খেতে ভালোবাসে কিনা এজাতীয় একটা কুটিল জিজ্ঞাসাও আমার মনে জেগে উঠেছে তত(ণে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম।

খানিকটা আসতেই গাড়িটা ঘস্ ঘস করে ব্রেক করল একটা। আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম — কিরে, বাঘ নাকি।

আর্দালিরা মুচকি হাসল — না হুজুর, এসে পড়েছি।

ভালো করে তাকিয়ে দেখি, সত্যিই তো। এসে পড়েছি সন্দেহ নেই। পথের বাঁ দিকে ঘন শালবনের ভেতরে একটুখানি ফাঁকা জমি। সেখানে কাঠের তৈরী বাংলো প্যাটার্নের একখানি দোতলা বাড়ি। এই নিবিড় জঙ্গলের ভেতরে যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত।

গাড়ির শব্দে বাড়িটার ভেতর থেকে দু-তিন জন চাপরাশী বেরিয়ে এল ব্যতিব্যস্ত হয়ে। এত(ণ ল(্য করিনি, এবার দেখলাম বাড়ির সামনে চওড়া একটি গড়খাই কাটা। লোকগুলো ধরাধরি করে মস্ত বড় একফালি কাঠ খাদটার ওপরে সাঁকোর মতো বিছিয়ে দিল। তারই ওপর দিয়ে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল রাজাবাহাদুর এন, আর চৌধুরীর হান্টিং বাংলোর সামনে।

আরে, আরে কী সৌভাগ্য! রাজাবাহাদুর যে স্বয়ং এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন আমার অপে(ায়। এক গাল হেসে বললেন, আসুন, আসুন, আপনার জন্য আমি এখানো চা পর্যন্ত খাইনি।

শ্রদ্ধায় আর বিনয়ে আমার মাথা নিচু হয়ে গেল। মুখে কথা জোগাল না, শুধু বেকুবের মতো কৃতার্থের হাসি হাসলাম একগাল।

রাজাবাহাদুর বললেন — এত কষ্ট করে আপনি যে আসবেন সে ভাবতেই পারিনি। বড় আনন্দ হল, ভারি আনন্দ হল। চলুন চলুন ওপরে চলুন।

এত গুণ না থাকলে কি আর রাজা হয়। একেই বলে রাজোচিত বিনয়।

রাজাবাহাদুর বললেন — আগে স্নান করে রিফ্রেশড হয়ে আসুন, টি ইজ গেটিং রেডি। বোয়, সাহাবক্যে গোসলখানামে লে যাও।

চল্লিশ বছরের দাড়িওয়ালা বয় নিঃসন্দেহে বাঙালী। তবু হিন্দী করে হুকুমটা দিলেন রাজাবাহাদুর, কারণ ওটাই রাজকীয় দস্তুর। বয় আমাকে গোসলখানায় নিয়ে গেল।

আশ্চর্য, এই জঙ্গলের ভেতরেও এত নিখুঁত আয়োজন। এমন একটা বাথ(মে জীবনে আমি স্নান করিনি। ব্রাকেটে তিন চারখান, সদ্য-পাট-ভাঙা নতুন তোয়ালে, তিনটে দামী সোপ, কেসে তিনি রকমের নতুন সাবান, র‍্যাকে দামী দামী তেল, লাইমজুস। অতিকায় বাথটাব — ওপরে ঝাঁঝরি। নিচে টিউব ওয়েল থেকে পাম্প করে এখানে ধারাস্নানের ব্যবস্থা। একেবারে রাজকীয় কারবার — কে বলবে এটা কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেল নয়।

স্নান হয়ে গেল। ব্রাকেটে ধোপদুরস্ত ফরাসডাঙার ধুতি, সিলকের লুঙ্গি, আদ্দির পাজামা। দামের দিক থেকে পাজামাটাই সস্তা মনে হল, তাই পরে নিলাম।

বয় বাইরেই দাঁড়িয়েছিল, নিয়ে গেল ড্রেসিং (মে। ঘরজোড়া আয়না, পৃথিবীর যা কিছু প্রসাধনের জিনিস কিছু আর বাকি নেই এখানে।

ড্রেসিং (ম থেকে বে(তে সোজা ডাক পড়ল রাজাবাহাদুরের লাউঞ্জে। রাজাবাহাদুর একখানা চেয়ারে চিত হয়ে শুয়ে ম্যানিলা চু(ট খাচ্ছিলেন। বললেন, আসুন চা তৈরী।

চায়ের বর্ণনা না করাই ভালো। চা, কফি, কোকো(ওভ্যালটিন, (টি, মাখন, পনির, চর্বিতে জমাট ঠাণ্ডা মাংস। কলা থেকে আরম্ভ করে পিচ্ পর্যন্ত প্রায় দশ রকমের ফল।

সেই গন্ধমাদন থেকে যা পারি গোগ্রাসে গিয়ে চললাম আমি। রাজাবাহাদুর কখনো এক টুকরো (টি খেলেন, কখনো একটা ফল। অর্থাৎ কিছুই খেলেন না, শুধু পর পর কাপ তিনেক চা ছাড়া। তারপর আর একট চু(ট ধরিয়ে বললেন — একবার জানালা দিয়ে চেয়ে দেখুন।

দেখলাম। প্রকৃতির এখন অপূর্ব রূপ জীবনে আর দেখিনি। ঠিক জানালার নিচেই মাটিটা খাড়া তিন চারশো ফুট নেমে গেছে, বাড়িটা যেন ঝুলে আছে সেই রা(যে শূন্যতার ওপরে। তলায় দেখা যাচ্ছে ঘন জঙ্গল, তার মাঝ দিয়ে পাহাড়ী নদীর একটা সঙ্কীর্ণ নীলোজ্জ্বল রেখা। যতদূর দেখা যায়, বিস্তীর্ণ অরণ্য চলেছে প্রসারিত হয়ে(তার সীমান্তে নীল পাহাড়ের প্রহরা।

আমার মুখ দিয়ে বে(ল — চমৎকার।

রাজাবাহাদুর বললেন — রাইট্। আপনারা কবি মানু, আপনাদের তো ভালো লাগবেই। আমারই মাঝে মাঝে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে মশাই। কিন্তু নিচের এই যে জঙ্গলটি দেখতে পাচ্ছেন ওটি বড় সুবিধের জায়গা নয়। টেরাইয়ের ওয়ান্ অব দি ফিয়ার্সেস্ট্ ফরেস্টস। একেবারে প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্ব।

আমি সভয়ে জঙ্গলটার দিকে তাকালাম। ওয়ান অব দি ফিয়ার্সেস্ট। কিন্তু ভয় পাওয়ার মতো কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না। চারশো ফুট নীচে ওই অতিকায় জঙ্গটাকে একটা নিরবচ্ছিন্ন বেঁটে গাছের ঝোপ বলে মনে হচ্ছে, নদীর রেখাটাকে দেখাচ্ছে উজ্জ্বল একখানা পাতের মতো। আশ্চর্য সবুজ, আশ্চর্য সুন্দর। অফুরন্ত রোদে ঝলমল করছে অফুরন্ত প্রকৃতি — পাহাড়টা যেন গ্যা নীল রং দিয়ে আঁকা। মনে হয় ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ওই স্তব্ধ গম্ভীর অরণ্য যেন আদর করে বুকে টেনে নেবে রাশি রাশি পাতার একটা নরম বিছানার ওপরে। অথচ —

আমি বললাম — ওখানেই শিকার করবেন নাকি?

— (্পেছেন, নামব কী করে। দেখছেন তো, পেছনে চারশো ফুট খাড়া পাহাড়। আজ পর্যন্ত ওখানে কোনো শিকারীর বন্দুক গিয়ে পৌঁছোয়নি। তবে হ্যাঁ, ঠিক শিকার করি না বটে, আমি মাঝে মাঝে মাছ ধরি ওখান থেকে।

— মাছ ধরেন! — আমি হাঁ করলাম ঃ মাছ ধরেন কি রকম? ওই নদী থেকে নাকি?

— সেটা ত্র(মশ প্রকাশ্য। দরকার হলে পরে দেখতে পাবেন — রাজাবাহাদুর রহস্যময় ভাবে মুখ টিপে হাসলেন ঃ আপাতত শিকারের আয়োজন করা যাক, কিছু না জুটলে মাছের চেষ্টাই করা যাবে। তবে ভালো টোপ ছাড়া আমার পছন্দ হয় না, আর তাতে অনেক হাঙ্গাম।

— কিছু বুঝতে পারছি না।

রাজাবাহাদুর জবাব দিলেন না, শুধু হাসলেন। তারপর ম্যানিলা চু(টের খানিকটা সুগন্ধি ধোঁয়া ছড়িয়ে বললেন — আপনি রাইফেল ছুঁড়তে জানেন?

বুঝলাম, কথাটাকে চাপা দিতে চাইছেন। সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাকে দমন করে ফেললাম আমি, এর পরে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাটা সঙ্গত হবে না, শোভনও নয়। সেটা কোর্ট-ম্যানারের বিরোধী।

রাজাবাহাদুর আবার বললেন — রাইফেল ছুঁড়তে পারেন?

বললাম — ছেলেবেলায় এয়ার গান ছুঁড়েছি।

রাজাবাহাদুর হেসে উঠলেন — তা বটে। আপনারা কবি মানুষ, ওসব অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপার আপনাদের মানায় না। আমি অবশ্য বারো বছর বয়সেই রাইফেল হাতে তুলে নিয়েছিলাম। আপনি চেষ্টা করে দেখুন না, কিছু শক্ত(ব্যাপার নয়।

উঠে দাঁড়ালেন রাজাবাহাদুর। ঘরের একদিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করে আমি দেখলাম — এ শুধু লাউঞ্জ নয়, রীতিমতো একটা ন্যাচারাল মিউজিয়াম এবং অস্ত্রাগার। খাওয়ার টেবিলেই নিমগ্ন ছিলাম বলে এত(ণ দেখতে পাইনি, নইলে এর আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল।

চারিদিকে সারি সারি নানা আকারের আগ্নেয়াস্ত্র। গোটাচারেক রাইফেল, ছোট বড় নানা রকম চেহারা। একটা হুকের সঙ্গে খাপে আঁটা এক জোড়া রিভলভার ঝুলছে, তার পাশেই দুলছে খোলা একখানা লম্বা শেফিল্ডের তরোয়াল — সূর্যের আলোর মতো তার ফলার নিষ্কলঙ্ক রঙ। মোটা চামড়ায় বেল্টে ঝকঝকে পেতলের কার্তুজ — রাইফেলের, রিভলভারের। জরিদার খাপে খানতিনের নেপালী ভোজালী। আর দেওয়ালের গায়ে হরিণের মাথা, ভালুকের মুখ, নানা রকমের চামড়া — বাঘের, সাপের, হরিণের, গো-সাপের। একটা টেবিলে অতিকায় হাতীর মাথা — দুটো বড় বড় দাঁত এগিয়ে আছে সামনের দিকে। বুঝলাম — এরা রাজাবাহাদুরের বীর কীর্তির নিদর্শন।

ছোট একটা রাইফেল তুলে নিয়ে রাজাবাহাদুর বললেন — একটা লাইট জিনিস। তবে ভালো রিপিটার(অনায়াসে বড় বড় জানোয়ার ঘায়েল করতে পারেন।

আমার কাছে অবশ্য সবই সমান। লাইট রিপিটার যা, হাউইট-জার কামানও তাই(তবু সৌজন্যর(ার জন্যে বলতে হল — বাঃ, তবে তো চমৎকার জিনিস।

রাজাবাহাদুর রাইফেলটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে(তা হলে চেষ্টা ক(ন। লোড করাই আছে, ছুঁ, ন ওই জানালা দিয়ে।

আমি সভয়ে তিন পা পেছিয়ে গেলাম। জীবনে বেকুবি অনেক করেছি, কিন্তু তার পরিমাণটা বাড়াতে আর প্রস্তুত নই। যুদ্ধ-ফেরৎ এক বন্ধুর মুখে তাঁর রাইফেল ছোঁড়ার প্রথম অভিজ্ঞতা শুনেছিলাম — পড়ে গিয়ে পা ভেঙে নাকি তাঁকে একমাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। নিজেকে যতদূর জানি — আমার ফাঁড়া শুধু পা ভাঙার ওপর দিয়েই কাটবে বলে মনে হয় না।

বললাম — ওটা এখন থাক, পরে হবে না হয়।

রাজাবাহাদুর মৃদু কৌতুকের হাসি হাসলেন। বললেন, এখন ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু একবার ধরতে শিখলে আর ছাড়তে চাইবেন না। হাতে থাকলে বুঝবেন কতবড় শক্তি(মান আপনি। ইউ ক্যান ইজিলি ফেস অল দ্য রাস্কেলস্ অব্ — অব্ —

হঠাৎ তাঁর চোখ ঝকঝক করে উঠল। মৃদু হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে শক্ত(হয়ে উঠলো মুখের পেশীগুলো ঃ অ্যাণ্ড এ রাইভ্যাল —

মুহূর্তে বুকের রক্ত(হিম হয়ে গেল আমার। রাজাবাহাদুরের দুচোখে বন্য হিংসা, রাইফেলটা এমন শক্ত(মুঠিতে বাগিয়ে ধরেছেন যে সামনে কাউকে গুলি করবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন তিনি। উত্তেজনার ঝোঁকে আমাকে যদি ল(্যভেদ করে বসেন তা হলে —

আতঙ্কে দেওয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি। কিন্তু তত(ণে মেঘ কেটে গেছে — রাজা-রাজড়ার মেজাজ। রাজাবাহাদুর হাসলেন।

— ওয়েল, পরে আপনাকে তালিম দেওয়া যাবে। সবই তো রয়েছে, যেটা খুসী আপনি ট্রাই করতে পারেন। চলুন, এখন বারান্দায় গিয়ে বসা যাক, লেটস্ হ্যাভ সাম এনার্জি।

প্রাতরাশেই প্রায় বিন্ধ্যপর্বত উদরাৎ করা হয়েছে, আর কী হবে এনার্জি সঞ্চিত হবে বোঝা শক্ত। কিন্তু কথাটা বলেই রাজাবাহাদুর বাইরের বারান্দায় দিকে পা বাড়িয়েছেন। সুতরাং আমাকেও পিছু নিতে হল।

বাইরে বারান্দায় বেতের চেয়ার, বেতের টেবিল। এখানে ঢোকবার পরে এত বিচিত্র রকমের আসনে বসছি যে আমি প্রায় নার্ভাস হয়ে উঠেছি। তবু যেন বেতের চেয়ারে বসতে পেরে খানিকটা সহজ অন্তরঙ্গতা অনুভব করা গেল। এটা অন্তত চেনা জিনিস।

আর বসবার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল এনার্জি কথাটার আসল তাৎপর্য কী। বেয়ারা তৈরীই ছিল, ট্রেতে করে একটি ফেনিল গ্লাস সামনে এনে রাখল — অ্যালকোহলের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে গেল বাতাসে।

রাজাবাহাদুর স্মিত হাস্যে বললেন — চলবে?

সবিনয়ে জানালাম, না।

— তবে বিয়ার আনবে? একেবারে মেয়েদের ড্রিঙ্ক! নেশা হবে না।

— নাঃ থাক। অভ্যেস নেই কোনোদিন।

— হুঁঃ, গুড কণ্ডাক্টের প্রাইজ পাওয়া ছেলে। রাজাবাহাদুরের সুরে অনুকম্পার আভাস ঃ আমি কিন্তু চৌদ্দ বছর বয়সেই প্রথম ড্রিঙ্ক ধরি।

রাজা-রাজড়ার ব্যাপার — সবই অলৌকিক। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেউটের বাচ্চা। সুতরাং মন্তব্য অনাবশ্যক। ট্রে বারবার যাতয়াত করতে লাগল। রাজাবাহাদুরের প্রখর উজ্জ্বল চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে এল ক্রমশ, ফর্সা গাল গোলাপী রং ধরল। হঠাৎ অসুস্থ দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

— আচ্ছা বলতে পারেন, আপনি রাজা নন কেন?

এরকম একটা প্রশ্ন করলে বোকার মতো দাঁত বের করে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। আমিও তাই করলাম।

— বলতে পারলেন না?

— না।

— আপনি মানুষ মারতে পারেন?

— এ আবার কী রকম কথা। আমার আতঙ্ক জাগল।

— না।

— তা হলে বলতে পারবেন না। ইউ আর অ্যাবসোলিউটলি হোপলেস।

উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ালেন রাজাবাহাদুর। বলে গেলন ঃ আই পিটি ইউ।

বুঝলাম নেশাটা বেশ চড়েছে। আমি আর কথা বাড়ালাম না, চুপ করে বসে রইলাম সেখানেই। খানিক পরেই ঘরের ভেতরে নাক ডাকার শব্দ। তাকিয়ে দেখি তাঁর লাউঞ্জের সেই চেয়ারটায় হাঁ করে ঘুমুচ্ছেন রাজাবাহাদুর, মুখের কাছে কতকগুলো মাছি উড়ছে ভনভন করে।

★ ★ ★

সেই দিন রাত্রেই শিকারের প্রথম অভিজ্ঞতা

জঙ্গলের ভেতর বসে আমি মোটরে। দুটো তীব্র হেড-লাইটের আলো পড়েছে সামনের সঙ্কীর্ণ পথে আর দুধারের শাল বনে। ওই আলোক-রেখার বাইরে অবশিষ্ট জঙ্গলটায় যেন প্রেত-পুরীর জমাট অন্ধকার। রাত্রির তমসায় আদিম হিংসা সজাগ হয়ে উঠেছে চারদিকে — অনুভব করছি সমস্ত স্নায়ু দিয়ে। এখানে হাতীর পাল ঘুরছে দুরের কোন পাহাড়ের পাথর গুঁড়িয়ে, গুঁড়িয়ে, ঝোপের ভেতরে অজগর প্রতী(া করে আছে অসতর্ক শিকারের আশায়, আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় উৎকর্ণ হয়ে আছে হরিণের পাল আর কোনো একটা খাদের ভেতরে জলজ্বল করছে (ুধার্ত বাঘের চোখ। কালো রাত্রিতে জেগে রয়েছে কালো অরণ্যের প্রাথমিক জীবন।

রোমাঞ্চিত ভীত প্রতী(ায় চুপ করে বসে আছি মোটরের মধ্যে। কিন্তু হিংসার রাজত্ব শালবন ডুবে আছে একটা আশ্চর্য স্তব্ধতায়। শুধু কানের কাছে অবিশ্রান্ত মশার গুঞ্জন ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। মাঝে মাঝে অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে — শালের পাতায় উঠছে এক একটা মৃদু মর্মর। আর কখনো কখনো ডাকছে বনমুরগী, ঘুমের মধ্যে পাখা ঝাপটাচ্ছে ময়ূর। মনে হচ্ছে এই গভীর ভয়ঙ্কর অরণ্যের ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলো যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে একটা নশ্চিন্ত কোনো মুহূর্তেরই প্রতী(া করে আছে।

আমরাও প্রতী(া করে আছি। মোটরের মধ্যে নিঃসাড় হয়ে বসে আছি আমরা — একটি কথাও বলবার উপায় নেই। রাইফেলের একটা ঝকঝকে নল এঞ্জিনের পাশে বাড়িয়ে দিয়ে শিকারী বাঘের মতোই তাকিয়ে আছেন রাজাবাহাদুর। চোখদুটো উদগ্র প্রখর হয়ে আছে হেড লাইটের তীব্র আলোক রেখাটার দিকে, একটা জানোয়ার ওই রেখাটা পে(বার দুঃসাহস করলেই রাইফেল গর্জন করে উঠবে।

কিন্তু জঙ্গলে সেই আশ্চর্য স্তব্ধতা। অরণয যেন আজ রাত্রে বিশ্রাম করছে, একটি রাত্রের জন্যে ক্লান্ত হয়ে জানোয়ারগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে খাদের ভেতরে, রোগের আড়ালে। কেটে চলেছে মন্থর সময়। রাজাবাহাদুরের হাতের রেডিয়াম ডায়াল ঘড়িটা একটা সবুজ চোখের মতো জ্বলছে, রাত দেড়টা পেরিয়ে গেছে। ত্র(মশ উসখুস করছেন উৎকর্ণ রাজাবাহাদুর।

— নাঃ হোপলেস। আজ আর পাওয়া যাবে না।

বহুদূর থেকে একটা তীব্র গম্ভীর শব্দী হাতীর ডাক। ময়ূরের পাখা ঝাপটানি চলছে মাঝে মাঝে। এক ফাঁকে একটা প্যাঁচা চেঁচিয়ে উঠল, রাত্রি ঘোষণা করে গেল শেয়ালের দল। কিন্তু কোথায় বাঘ, কোথায় বা ভালুক? অন্ধকার বনের মধ্যে দ্রুত কতকগুলো ছুটন্ত খুরের আওয়াজ — পালিয়ে গেল হরিণের পাল।

কিন্তু কোনো ছায়া পড়ছে না আলোকবৃত্তের ভেতরে। মশার কামড় যেন অসহ্য হয়ে উঠছে।

— বৃথাই গেল রাতটা। — রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বরে পৃথিবীর সমস্ত বিরক্তি(ভেঙ্গে পড়ল ঃ ডেভিল্ লাক। সীটের পাশ থেকে একটা ফ্লাস্ক তুলে নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে ঢাললেন গলাতে, ছড়িয়ে পড়ল হুইস্কির উগ্র উত্তপ্ত গন্ধ।

— থ্যাঙ্ক হেভন্স্। — রাজাবাহাদুর হঠাৎ নড়ে বসলেন চকিত হয়ে। ন(ত্রবেগে হাতটা চলে গেল রাইফেলের ট্রিগারে। শিকার এসে পড়েছে।

আমিও দেখলাম। বহুদূরে আলোর রেখাটার ভেতরে কী একটা জানোয়ার দাড়িয়ে পড়েছে স্থির হয়ে। এমন

একটা জোরালো আলো চোখে পড়াতে কেমন দিশেহারা হয়ে গেছে, তাকিয়ে আছে এই দিকেই। দুটো প্রদীপের আলোর মতো ঝিক ঝিক করছে তার চোখ।

ড্রাইভার বললে — হায়না।

— ড্যাম — রাইফেল থেকে হাত সরিয়ে নিলেন রাজাবাহাদুর, কিন্তু পর মুহূর্তেই চাপা উত্তেজিত গলায় বললেন — থাক, আজ ছুঁচোই মারব।

দুম করে রাইফেল গর্জন করে উঠল। কানে তালা ধরে গেল আমার। বা(দের গন্ধে বিস্বাদ হয়ে উঠল নাসারন্ধ্র। অব্যর্থ ল(্য রাজাবাহাদুরের — পড়েছে জানোয়ারটা।

ড্রাইভার বললে — তুলে আনব হুজুর?

বিকৃতমুখে রাজাবাহাদুর বললেন — কী হবে? গাড়ি ঘোরাও।

রেডিয়াম ডায়ালের সবুজ আলোয় রাত তিনটে। গাড়ি ফিরে চলল হান্টিং বাংলোর দিকে। একটা ম্যানিলা চু(ট ধরিয়ে রাজাবাহাদুর আবার বললেন — ড্যাম্।

কিন্তু কী আশ্চর্য — জঙ্গল যেন রসিকতা শু(করেছে আমাদের সঙ্গে। দিনের বেলা অনেক চেষ্টা করেও দুটো একটা বনমুরগী ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না — এমনকি একটা হরিণ পর্যন্ত নয়। নাইটশুটিংয়েও সেই অবস্থা। পর পর তিন রাত্রি জঙ্গলের নানা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে চেষ্টা করা হল, কিন্তু নগদ লাভ যা ঘটল তা অমানুষিক মশার কামড়। জঙ্গলের হিংস্র জন্তুর সা(াৎ মিলল না বটে, কিন্তু মশাগুলোকে চিনতে পারা গেল। এমন সাংঘাতিক মশা যে পৃথিবীর কোথাও থাকতে পারে এতদিন এ ধারণা ছিল না আমার।

তবে মশার কামড়ের (তিপূরণ চলতে লাগল গন্ধমাদন উজাড় করে। সত্যি বলতে কী, শিকার করতে না পারলেও মনের দিক থেকে বিন্দুমাত্র (ে াব ছিল না আমার। জঙ্গলের ভেতরে এমন রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন কল্পনারও বাইরে। জীবনে এমন দামী খাবার কোনো দিন মুখে তুলিনি, এমন চমৎকার বাথ(মে স্নান করিনি কখনো, এত পু(জাজিমের বিছানায় শুয়ে অস্বস্তিতে প্রথম দিন তো ঘুমুতেই পারিনি আমি। নিবিড় জঙ্গলের নেপথ্যে গ্র্যান্ড হোটেলের স্বাচ্ছেন্দ্যে দিন কাটাচ্ছি — শিকার না হলেও কণামাত্র (তি নেই কোথাও। প্রত্যেক দিনই লাউঞ্জে চা খেতে খেতে চারশো ফুট নিচেকার ঘন জঙ্গলটার দিকে চোখ পড়ে। সকালের আলোয় উদ্ভাসিত।

— হুম্। — অদৃষ্টকেও বদলানো চলে। — রাজাবাহাদুর উঠে পড়লেন ঃ আমার সঙ্গে আসুন।

দুজনে বেরিয়ে এলাম। রাজাবাহাদুর আমাকে নিয়ে এলেন হান্টিং বাংলোর পেছন দিকটাতে। ঠিক সেখানে — যার চারশো ফুট নিচে টেরাইয়ের অন্যতম হিংস্র অরণ্য বিস্তীর্ণ হয়ে আছে।

এখানে আসতে আর একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল। দেখি কাঠের একটা রেলিং দেওয়া সাঁকোর মতো জিনিস সেই সীমাহীন শুন্যতার ওপরে প্রায় পনেরো ষোল হাত প্রসারিত হয়ে আছে। তার পাশে দুটো বড় কাঠের চাকা, তাদের সঙ্গে হুক লাগানো দুজোড়া মোটা কাছি জড়ানো। ব্যাপাটা কী ঠিক বুঝতে পারলাম না।

— আসুন। — রাজাবাহাদুর সেই ঝুলন্ত সাঁকোটার ওপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমিও গেলাম তাঁর পেছনে পেছনে। একটা আশ্চর্য বন্দোবস্ত। ঠিক সাঁকোটার নিচেই পাহাড়ী নদীটার রেখা, নুড়ি মেশানো সঙ্কীর্ণ বালুতট

তার দুপাশে, তাছাড়া জঙ্গল আর জঙ্গল। নিচে তাকাতে আমার মাথা ঘুরে উঠল। রাজাবাহাদুর বললেন, জানেন এসব কী?

— না।

— আমার মাছ ধরবার বন্দোবস্ত। এর কাজ খুব গোপনে — নানা হাঙ্গামা আছে। কিন্তু অব্যর্থ।

— ঠিক বুঝতে পারছি না।

— আজ রাত্রেই বুঝতে পারবেন। শিকার দেখতে আপনাকে ডেকে এনেছি, নতুন একটা শিকার দেখাব। কিন্তু কোনোদিন এর কথা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না।

কিছু না বুঝেই মাথা নাড়লাম — না।

— তা হলে আজ রাতটা অবধি থাকুন। কাল সকালেই আপনার গাড়ির ব্যবস্থা করব। — রাজাবাহাদুর আবার হান্টিং বাংলোর সম্মুখের দিকে এগোলেন ঃ কাল সকালের পরে এমনিতেই আপনার আর এখানে থাকা চলবে না।

একটা কাঠের সাঁকো, দুটো কপিকলের মতো জিনিস। মাছ ধরবার ব্যবস্থা। কাউকে বলা যাবে না এবং কাল সকালেই চলে যেতে হবে। সবটা মিলিয়ে যেন রহস্যের খাসমহল একেবারে। আমার কেমন এলোমেলো লাগতে লাগল সমস্ত। কিন্তু ভালো করে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, রাজাবাহাদুরকে বেশি প্র্ে করতে কেমন অস্বস্তি লাগে আমার। অনধিকার চর্চা মনে হয়।

শ্যামলতা দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে আছে অপরূপ প্রসন্নতায়। ওয়ান অব দি ফিয়ার্সেস্ট ফরেস্টস। বিশ্বাস হয় না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি বাতাসে আকার-অবয়বহীন পত্রাবরণ সবুজ সমুদ্রের মতো দুলছে, চত্র(দিচ্ছে পাখীর দল — এখান থেকে মৌমাছির মতো দেখায় পাখিগুলোকে(জানালার ঠিক নিচেই ইস্পাতের ফলার মতো পাহাড়ী নদীটার নীলিমোজ্জ্বল রেখা — দুটো একটা নুড়ি ঝকমক করে মরিখণ্ডের মতো। বেশ লাগে।

তারপরেই চমক ভাঙে আমার। তাকিয়ে দেখি ঠোঁঠের কোণে ম্যানিলা চু(ট পুড়ছে, অস্থির চঞ্চল পায়ে রাজাবাহাদুর ঘরের ভেতরে পায়চারি করছেন। চোখে মুখে একটা চাপা আত্রে(াশ — ঠোঁট দুটোর নিষ্ঠুর কঠিনতা। কখনো একটা রাইফেল তুলে নিয়ে বিরত্তি(ভরে নামিয়ে রাখেন, কখনো ভোজালি তুলে নয়ে নিজের হাতের ওপরে ফলাটা রেখে পরী(া করেন সেটার ধার, আবার কখনো বা জানালার সমানে খানি(ণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন নিচের জঙ্গলটার দিকে। আজ তিন দিন থেকে উল্লেখযোগ্য একটা কিছু শিকার করতে পারেন নি — (্ াভে তাঁর দাঁতগুলো কড়মড় করতে থাকে।

তারপরেই বেরিয়ে যান এনার্জি সংগ্রহের চেষ্টার। বাইরের বারান্দায় গিয়ে হাঁক দেন — পেগ।

কিন্তু পরের পয়সায় রাজভোগ খেয়ে এবং রাজোচিত বিলাস করে বেশি দিন কাটানো আর সম্ভব নয় আমার প(। রাজাবাহাদুরের অনুগ্রহ একটা দামী জিনিস বটে, কিন্তু কলকাতায় আমার ঘর-সংসার আছে, একটা দায়িত্ব আছে তার। সুতরাং চতুর্থ দিন সকালে কথাটা আমাকে পাড়তে হল।

বললাম, এবার আমাকে বিদায় দিন তা হলে।

রাজাবাহাদুর সবে চতুর্থ পেয়ে চুমুক দিয়েছেন তখন। তেমনি অসুস্থ আর রক্ত(াভ চোখে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, আপনি যেতে চান?

— হ্যাঁ, কাজকর্ম রয়েছে —

— কিন্তু আমার শিকার আপনাকে দেখাতে পারলাম না।

— সে না হয় আর একবার হবে।

— হুম্। — চাপা ঠোঁটের ভেতরেই একটা গম্ভীর আওয়াজ করলেন রাজাবাহাদুর ঃ আপনি ভাবছেন আমার ওই রাইফেলগুলো, দেওয়ালে ওই সব শিকারের নমুনা — ওগুলো সব ফার্স?

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, না, না, তা কেন ভাবতে যাব। শিকার তো খানিকটা অদৃষ্টের ব্যাপার —

বাংলোর সামনে তিন চারটে ছোট ছোট নোংরা ছেলেমেয়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে, হিন্দুস্থানী কীপারটার বেওয়ারিশ সম্পত্তি। কীপারটাকে সকালে রাজাবাহাদুর শহরে পাঠিয়েছেন, কিন্তু দরকারী জিনিসপত্র কিনে কাল সে ফিরবে। ভারী বি(াসী আর অনুগত লোক। মাতৃহীন ছেলেমেয়েগুলো সারাদিন হুটোপুটি করে ডাক বাংলোর সামনে। রাজাবাহাদুর বেশ অনুগ্রহের চোফে দেখেন ওদের। দোতলার জানলা থেকে পয়সা, (টি কিংবা বিস্কুট ছুঁড়ে দেন, নিচে ওরা সেগুলো নিয়ে কুকুরের মতো লোফালুফি করে। রাজাবাহাদুর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন সকৌতুকে।

আজও ছেলেমেয়েগুলো হুল্লোড় করে তাঁর চারপাশে এসে ঘিরে দাঁড়ালো। বলল — হুজুর, সেলাম। — রাজাবাহাদুর পকেটে হাত দিয়ে কতকগুলো পয়সা ছড়িয়ে দিলেন ওদের ভিতর। হরির লুটের মতো কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

বেশ ছেলেমেয়েগুলি। দুই থেকে আট বছর পর্যন্ত বয়েস। আমার ভারি ভালো লাগে ওদের। আরণ্যক জগতের শাল শিশুদের মতো সতেজ আর জীবন্ত, প্রকৃতির ভেতর থেকে প্রাণ আহরণ করে বড় করে উঠেছে।

সন্ধ্যার ডিনার টেবিলে বসে আমি বললাম, আজ রাত্রে মাছ ধরবার কথা আছে আপনার।

চোখের কোণা দিয়ে আমার দিকে তাকালেন রাজাবাহাদুর। ল(্য করেছি আজ সমস্ত দিন বড় বেশি মদ খাচ্ছেন আর ত্র(মাগত চু(ট টেনে চলেছেন। ভালো করে আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেননি। ভেতরে ভেতরে কিছু একটা ঘটে চলেছে তাঁর।

রাজাবাহাদুর সং(পে বললেন — হুম্।

আমি সসংকোচে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন হবে?

একমুখ ম্যানিলা চু(টের ধোঁয়া ছড়িয়ে তিনি জবাব দিলেন — সময় হলে ডেকে পাঠাব। এখন আপনি গিয়ে শুয়ে প, ন। স্বচ্ছন্দে কয়েকঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারেন।

শেষ কথাটা পরিষ্কার আদেশের মতো শোনালো। বুঝলাম আমি বেশি(ণ আজ তাঁর সঙ্গে কথা বলি এ তিনি চান না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে বলাটা অতিথিপরায়ণ গৃহস্থের অনুনয় নয়, রাজার নির্দেশ। এবং সে নির্দেশ পালন করতে বিলম্ব না করাই ভালো।

কিন্তু অতি নরম জাজিমের বিছানায় শুয়েও ঘুম আসছে না। মাথার ভেতরে আবর্তিত হচ্ছে অসংলগ্ন চিন্তা। মাছধরা, কাঠের সাঁকো, কপিকল, অত্যন্ত গোপনীয়। অতল রহস্য।

তারপর এপাশ ওপাশ করতে করতে কখন যে চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে এল তা আমি নিজেই টের পাইনি।

মুখের ওপরে ঝাঁঝাঁলো একটা টর্চের আলো পড়তে আমি ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। রাত তখন ক'টা ঠিক জানি না। আরণ্যক পরিবেশ নির্জনতায় আভিভূত। বাইরে শুধু তীব্রকণ্ঠ ঝিঁঝির ডাক।

আমায় গায়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা হাত পড়েছে কার। সে হাতের স্পর্শে পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে গেল আমার। রাজাবাহাদুর বললেন — সময় হয়েছে, চলুন।

আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম — ঠোঁটে আঙুল দিয়ে রাজাবাহাদুর। — কোনো কথা নয়, আসুন।

এই গভীর রাত্রে এমনি নিঃশব্দে আহ্বান — সবটা মিলিয়ে একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাসের পটভূমি তৈরী হয়েছে যেন। কেমন একটা অস্বস্তি, একটা অনিশ্চিত ভয়ে গা ছমছম করতে লাগল আমার। মন্ত্রমুগ্ধের মতো রাজাবাহাদুরের পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলাম।

হান্টিং বাংলোটা অন্ধকার। একটা মৃতুযর শীতলতা ঢেকে রেখেছে তাকে। একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক— চারদিকে অরণ্যে কান্নার শব্দের মতো পত্রমর্মর। গভীর রাত্রিতে জঙ্গলের মধ্যে মোটর থামিয়ে বসে থাকতে আমায় ভয় করছিল, আজও ভয় করছে। কিন্তু এ ভয়ের চেহারা আলাদা — এর মধ্যে আর একটা কী যেন মিশে আছে ঠিক বুঝতে পারছি না, অথচ পাও সরতে চাইছে না আমার। মুখের ওপরে একটা টর্চের আলো, রাজাবাহাদুরের হাতের স্পর্শটা বরফের মতো ঠাণ্ডা, ঠোঁটে আঙুল দিয়ে নীরবতার সেই দুর্বোধ্য কুটিল সংকেত।

টর্চের আলোয় পথ দেখিয়ে রাজাবাহাদুর আমাকে সেই ঝুলন্ত সাঁকোটার কাছে নিয়ে এলেন। দেখি তার ওপরে শিকারের আয়োজন। দুখানা চেয়ার পাতা, দুটো তৈরী রাইফেল। দুজন বেয়ারা একটা কপিকলের চাকা ঘুরিয়ে কী একটা জিনিস নামিয়ে দিচ্ছে নিচের দিকে। এক মুহূর্তের জন্য রাজাবাহাদুর তাঁর নয় সেলের হান্টিং টর্চটা নিচের দিকে ফ্ল্যাশ করলেন। প্রায় আড়াইশো ফুট নিচে সাদা পুঁটলির মতো কী একটা জিনিস কপিকলের দড়ির সঙ্গে নেমে যাচ্ছে দ্রুতবেগে।

আমি বললাম, ওটা কি রাজাবাহাদুর?

— মাছের টোপ।

— কিন্তু এখনো কিছু বুঝতে পারছি না।

— একটু পরে বুঝবেন। এখন চুপ ক(ন।

এবারে স্পষ্ট ধমক দিলেন আমাকে। মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে হুইস্কির তীব্র গন্ধ বে(চ্ছে। রাজাবাহাদুর প্রকৃতিস্থ নেই। আর কিছুই বুঝতে পারছি না আমি — আমার মাথার ভেতরে সব যেন গণ্ডগোল হয়ে গেছে। একটা দুর্বোধ্য নাটকের নির্বাক দ্রষ্টার মতো রাজাবাহাদুরের পাশের চেয়ারটাতে আসন নিলাম আমি।

ওদিকে ঘন কালো বনান্তের ওপরে ভাঙা চাঁদ দেখা দিল। তার খানিকটা ম্লান আলো এসে পড়ল চারশো ফুট নিচের জলে, তার ছড়ানো মণিখণ্ডের মতো নুড়িগুলোর ওপরে। আবছাভাবে যেন দেখতে পাছি —

কপিকলের দড়ির সঙ্গে বাঁধা সাদা পুঁটলিটা অল্প অল্প নড়ছে বালির ওপরে। এক হাতে রাজাবাহাদুর রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে আছেন, আর এক হাতে মাঝে মাঝে আলোটা ফেলছেন নিচের পুঁটলিটায়। চকিত আলোয় যেটুকু মনে হচ্ছে — পুঁটলিটা যেন জীবন্ত অথচ কী জিনিস কিছু বুঝতে পারছি না। এ নাকি মাছের টোপ। কিন্তু কী এ মাছ — এ কিসের টোপ?

আবার সেই স্তব্ধতার প্রতী(া। মুহূর্ত কাটছে, মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে। রাজাবাহাদুরের টর্চের আলো বারে বারে পিছলে পড়ছে নিচের দিকে। দিগন্তপ্রসার হিংস্র অরণ্য ভাঙা-ভাঙা জ্যোৎস্নায় দেখাচ্ছে তরঙ্গিত একটা সমুদ্রের মতো। নিচের নদীটা ঝকঝক করছে, যেন একখানা খাপখোলা তলোয়ার। অবাক বিস্ময়ে আমি বসে আছি। মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে। টোপ ফেলে মাছ ধরছেন রাজাবাহাদুর।

অথচ সব ধোঁয়াটে লাগছে আমার(কান পেতে শুনছি — ঝিঁঝির ডাক, দুরে হাতীর গর্জন, শালপাতার মর্মর। এ প্রতী(ার তত্ত্ব আমার কাছে দুর্বোধ্য। শুধু হুইস্কি আর ম্যানিলা চু(টের গন্ধ নাকে এসে লাগছে আমার। মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে, রেডিয়াম ডায়াল ঘড়ির কাঁটা চলছে ঘুরে। ত্র(মশ যেন সম্মোহিত হয়ে গেলাম, ত্র(মশ যেন ঘুম এল আমার। তারপরেই হঠাৎ কানের কাছে বিকট শব্দে রাইফেল সাড়া দিয়ে উঠল — চারশো ফুট নিচে থেকে ওপরের দিকে উৎ(প্ত হয়ে উঠল প্রচণ্ড বাঘের গর্জন। চেয়ারটা শুদ্ধ আমি কেঁপে উঠলাম।

টর্চের আলোটা সোজা পড়ছে নুড়ি-ছড়ানো বালির ডাঙাটার ওপরে। পরিস্কার দেখতে পেলাম ডোরাকাটা অতিকায় একটা বিশাল জানোয়ার সাদা পুঁটলিটার ওপরে একখানা থাবা চাপিয়ে দিয়ে পড়ে আছে, সাপের মতো ল্যাজ আছড়াচ্ছে অন্তিম আ(পে। ওপর থেকে ইন্দ্রের বজ্রের মতো অব্যর্থ গুলি গিয়ে লেগেছে তার মাথায়। এত ওপর থেকে এমন দুর্নিবার মৃত্যু নামবে আশঙ্কা করতে পারেনি। রাজাবাহাদুর সোৎসাহে বললেন — ফতে।

এত(ণে মাছ ধরবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। সোল্লাসে বললাম, মাছ তো ধরলেন, ডাঙায় তুলবেন কেমন করে?

— ওই কপিকল দিয়ে। এই জন্যেই তো ওগুলোর ব্যবস্থা।

ব্যাপারটা যেমন বিচিত্র, তেমনি উপভোগ্য। আমি রাজাবাহাদুরকে অভিনন্দিত করতে যাব, এমন সময় — এমন সময় — পরিষ্কার শুনতে পেলাম শিশুর গোঙানি। (ীণ অথচ নির্ভুল। কিসের শব্দ।

চারশো ফুট নিচে থেকে ওই শব্দটা আসছে। হ্যাঁ — কোনো ভুল নেই। মুখের বাঁধন খুলে গেছে, কিন্তু বড় দেরীতে। আমার বুকে রক্ত(হিম হয়ে গেল, আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল। আমি পাগলের মতো চীৎকার করে উঠলাম, রাজাবাহাদুর, কিসের টোপ আপনার। কী দিয়ে আপনি মাছ ধরলেন?

— চুপ — একটা কালো রাইফেলের নল আমার বুকে ঠেকালেন রাজাবাহাদুর। তারপরেই আমার চারদিকে পৃথিবীটি পাক খেতে খেতে হাওয়ায় গড়া একটা বুদ্বুদের মতো শূন্যে মিলিয়ে গেল। রাজাবাহাদুর জাপটে না ধরলে চারশো ফুট নিচেই পড়ে যেতাম হয়তো।

★ ★ ★

কীপারের একটা বেওয়ারিশ ছেলে যদি জঙ্গলে হারিয়ে গিয়ে থাকে, তা অস্বাভাবিক নয়, তাতে কারো (তি নেই। কিন্তু প্রকাণ্ড রয়্যাল বেঙ্গল মেরেছিলেন রাজাবাহাদুর — লোককে ডেকে দেখানোর মতো।

তার আটমাস পরে এই চমৎকার চটিজোড়া উপহার এসেছে। আট মাস আগেকার সে রাত্রি এখন স্বপ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু এই চটিজোড়া অতি মনোরম বাস্তব। পায়ে দিয়ে একবার হেঁটে দেখলাম, যেমন নরম তেমনি আরাম!

৬৭.৫ সারাংশ

চলচ্চিত্রের জগতে বহু ব্যবহৃত ফ্ল্যাশব্যাক রীতিতে রচিত টোপ গল্পের মধ্যে সুদ(শৈলীতে জনৈক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর আত্মকেন্দ্রিক সতর্কতা এবং বিবেকদংশনের দোলাচলতা একদিকে, অন্যদিকে কাঞ্চনগর্বী এবং প্রতাপদম্ভী এক অভিজাত পু(ষের দানবিক নির্মমতার রূঢ়, বাস্তবসম্মত চিত্রায়ণ করা হয়েছে। প্রথম থেকে অনেকদূর অবধি একটা আলতো পরিহাসের মাধ্যমে কুণ্ঠিত আত্মসমালোচক ভঙ্গীতে লেখক গল্পটিকে টেনে নিয়ে গেছেন। গল্পের শেষে আর লঘুতরল সেই পরিহাস মর্জিটুকুর অস্তিত্ব নেই। আত্মসমালোচনা তখন প্রায় এক ধরনের অনুত্ত(অথচ তীব্র আত্মধিক্কারের রূপ ধরেছে বলা চলে।

উত্তর বাংলার তরাই অঞ্চলের ঘন জঙ্গলে ঘেরা একটি জমিদারী এস্টেট — রামগঙ্গা। তার মালিক রাজাবাহাদুর বলে পরিচিত এন. আর. চৌধুরীর সঙ্গে (গল্পের কথক) এক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর আলাপ, এবং ত্র(মে ত্র(মে ঘনিষ্ঠতা হয়। বস্তুতপ(ে, মনিব-মোসাহেব ধরনের যেন একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁদের ভিতরে — যদিচ, আপাতভাবে তা বন্ধুত্বের মোড়কেই বাঁধা!

এই হলো এ-গল্পের পটভূমিকা। এ-হেন রাজাসাহেবের আমন্ত্রণে তাঁর জমিদারীতে কথক আমন্ত্রিত হলেন শিকার দেখতে। প্রভূত আদর-আপ্যায়নের মধ্যেও অহংকারী এই ভূম্যধিকারীর চরিত্রের আরো নানান্ অন্ধকার পত্যন্ত তাঁর সামনে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে। অন্যদিকে বেশ কয়েক রাত জঙ্গলে কাটানোর পরেও শিকার বলতে গেলে মেলে না কিছুই। সেই 'ব্যর্থতা' রাজাসাহেবের সামন্ততান্ত্রিক অহমিকাকে প্রবলভাবে আহত করে তোলে। এবং তিনি 'কথা' দেন যে, নায়কের অরণ্যবাসের শেষরাত্রে একটা অত্যাশ্চর্য শিকারের ঘটনার প্রত্য(দর্শী হবেনই গল্পের কথক।

শিকারের বিলি-ব্যবস্থা হলো সত্যিই অভিনব ভাবে। রাজাসাহেবের হান্টিং বাংলোটা চারশো ফিট খাড়াই পাহাড়ের ওপরে। তার পিছন দিকে একটা কাঠের ঝুলবারান্দার মতো লম্বা পাটাতন থেকে নিশুতি রাতের স্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে একজোড়া কপিকলের সাহায্যে সাদা পুঁটলিতে জড়ানো কি যেন একটা নিচের নদীর পাড়ে, জঙ্গলের ধারে নামিয়ে দেওয়া হলো। দীর্ঘসময় কাটবার পর হঠাৎ স্তব্ধতা ভাঙে গুলির আওয়াজে — রাজাবাহাদুরের অমোঘ রাইফেলের বুলেট গিয়ে বিঁধেছে ঐ পুঁটলিবাঁধা 'টোপ'-এর লোভে আসা বিশাল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের কপালে। ঠিক সেই মুহূর্তে মরণাহত ব্যাঘ্রের গর্জনের ভয়াল ধ্বনির মধ্য থেকেও ভেসে এল চারশো ফিট ওপরে ঐ ঝুলন্ত মাচান অবধি একটি শিশুর অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ। বিমূঢ় হয়ে, ও কিসের আওয়াজ, বাঘের জন্য কেমন 'টোপ' নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই প্র(সুধোতেই 'রাজা' এন. আর. চৌধুরীর বন্দুকের নল স্পর্শ করে কাহিনী-কথকের মধ্যবিত্ত বুকের দুর্বল ছাতি আর তাঁর কানে আসে চুপ করে থাকার জন্য প্রচণ্ড এক ধমক।

দীর্ঘ আটমাস পরে পার্শেলে পাঠানো একজোড়া বাঘের চামড়ার মহার্ঘ চটি উপহার পেয়ে, গল্প-কথক প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে না পারলেও, অচিরেই তাঁর স্মরণে এল ঐ তরাই জঙ্গলে 'টোপ' ফেলে বাঘ শিকারের

কাহিনী ঃ সমস্ত ঘটনাটা তাঁর মনে ভেসে উঠল স্মৃতি রোমন্থনের সূত্রে। তারপরে আবার আটমাস পরের নাগরিক পরিবেশে মানসিকভাবে ফিরে এসে তাঁর মনে হলো, ঐ রাতের ঘটনাটা 'স্বপ্ন' হয়ে থাকাই সম্ভবত শ্রেয়। 'বাস্তব' হয়ে থাকুক বরং এই মূল্যবান একজোড়া চটি।

৬৭.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গল্প বিশ্লেষণ

এই গল্পের মধ্যে আদিম আরণ্যক পরিবেষ্টনীর মধ্যে আত্মস্মন্য অহং-বোধ মাতাল এক স্বৈরাচারী সামন্ত প্রভুর ভয়াল চরিত্রটির যেমন উদ্‌ঘাটন হয়েছে, তারই পাশাপাশি এর মধ্যে মধ্যবিত্তের দুর্বল দোলাচলতার নি(পায় রূপটিও সুদ(ভাবে হয়েছে চিত্রায়িত। এই দুই ভিন্ন শ্রেণীচরিত্র — কাহিনীর দুটি মুল কুশীলবের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। আর মর্মান্তিক এবং ভয়ংকর একটি ট্র্যাজিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তারই সূত্রে। এরই সঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় বিষয় হলো নারায়ণবাবুর ভাষার স্টাইল। হিউমার এবং স্যাটায়ারের ঠাসবুনুনির নক্সার মধ্যে ধীরে ধীরে তিনি ফুটিয়েছেন গদ্য কবিতার স্পন্দনধর্ম আর তার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র শৈলীতে সৃষ্ট কয়েকটি চিত্রকল্প। এই সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে গল্পের ভয়াল পরিসমাপ্তি। আবার তার ঠিক পরেই লেখক ফিরে গেছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্যাটায়ারে(সুতীব্র এক আত্মধিক্কারে। তখন আর পরিহাসমর্জির কোনো প্রকাশ নেই(হিউমারের কোনো সংকেত সেখানে নিরস্তিত্ব।

রামগঙ্গা এস্টেটের এই 'রাজাবাহাদুর' এন. আর. চৌধুরী হলেন বনেদী, অভিজাতবংশীয় এক মধ্যবয়স্ক সামন্ত প্রভু — যিনি বিংশ শতাব্দীর অর্ধেকটা অতিত্র(ম করে এসেও মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী প্রতাপের দম্ভে বুঁদ হয়ে আছেন। চৌদ্দ বছর বয়সেই তিনি প্রথম মদ্যপান শু(করেছিলেন, আর তারও দু-বছর আগে থেকে হাত মক্‌সো করেছেন রাইফেলের ট্রিগার টিপে। কৈশোর যাঁর আরম্ভ হয়েছিল এভাবে, প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হবার পর তাঁর দম্ভ এবং স্বৈরাচার কোথায় যে যেতে পারে, তা তো সহজেই অনুমেয়(কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই মানুষটির সামন্ততান্ত্রিক নৃশংসতাকে যে অতলান্ত গভীর একটি স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন তা কিন্তু স্বাভাবিক অনুমান-(মতার নাগালের বাইরে। সাধারণভাবে বন্দুকের পাল্লায় বাঘ পাওয়া যাচ্ছে না বলে, তাকে প্রলুব্ধ করে আনার জন্য দু-বছরের মানুষশিশুর হাতমুখ বেঁধে টোপ হিসেবে চারশো ফিট ওপর থেকে গহন অরণ্যের অন্ধকারে নামিয়ে দেবার পিছনে যে উদ্ভাবনী শক্তি(ই থাকুন না কেন, তা কিন্তু ভয়াবহরূপেই দানবিক। ব(্যমাণ এই রাজাবাহাদুরটির এই দানবমূর্তিটা মাঝে-মাঝেই অবশ্য কাহিনীর মধ্যে আবছা ঝিলিক দিয়ে গেছে বাইরের সম্ভ্রান্ততার খোলসটুকু সরিয়ে। এই মানুষটির নৃশংসতার মাত্রা যে কতখানি ব্যাপক তার পরিচয় মেলে নিজের একান্ত অনুগত বি(্বাসী এক কর্মচারীকে কাজের ছুতো করে সরিয়ে দিয়ে, তারই একটি মাতৃহীন সন্তানকে এমনভাবে বাঘশিকারের জন্য টোপ হিসেবে ব্যবহার করার ঘটনার মধ্যে। নিতান্ত কাছের মানুষ — যে সদাসর্বদা প্রভুর কাজেই নিয়োজিত প্রাণ — তারই প্রতি যদি এভাবে বি(্বাসঘাতকতা করা হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি(টির দানবীয়তা যে কোন পর্যায়ের, সেকথা তো আর বুঝিয়ে বলার অপে(া রাখে না।

এই ধরনের মানুষেরা আন্তরিকভাবেই স্তাবকতা পছন্দ করে থাকে, এবং আলোচ্য রাজাবাহাদুরটিও সেই প্রবণতা থেকে মুক্ত(নন। গল্পের কথককে তাঁর গুণগ্রাহীরূপে (প্রকৃতপ(মোসাহেব হিসেবেই!) দেখে তাঁর মনের মধ্যে প্রকট হয়ে থাকা আত্মম্ভরিতার বোধটা পরিতৃপ্ত হয়। সোনার হাতঘড়ি উপহার (আসলে যা, তাঁর নামে স্তুতিমূলক 'পদ্য' লিখে দেবার জন্য পারিশ্রমিক, বা বখসিস।) দেওয়া প্রায়ই চায়ের আসরে ডাকা কিংবা

শিকার দেখতে তরাইয়ের এস্টেটে নিমন্ত্রণ করা — এইসব 'সৌজন্য' বস্তুতপ(ে রাজাসাহেবের বনোদীয়ানার মুখোস ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত রূঢ় দাম্ভিকতা ধরা পড়ে মাঝে-মাঝেই, কথা এবং আচরণের মাধ্যমে। হত্যার কিংবা মদ্যের নেশায় যখনই তিনি বুঁদ হয়ে যান, তখনই তাঁর মুখোশটা পড়ে খসে। তখন তিনি সমাদরে নিমন্ত্রণ করে আনা অতিথিকে বিদ্রূপ-অপমান-টিট্‌কিরি—কোনো কিছুর দ্বারাই জর্জরিত করতে সংকোচ বোধ করেন না। আবার 'মুখোশ' খুলে যাবার সম্ভাব্য আশঙ্কায় নিজেই সেই আমন্ত্রিতকে প্রকারান্তরে 'বিদেয় হও' বলতেও রাজাবাহাদুর আকুণ্ঠিত(এবং যে মুহূর্তে শেষ 'মুখোশ' আচমকাই খাসে যায়, তখন তিনি তার বুকের ওপরে গুলিভরা বন্দুকের নল চেপে ধরতেও নির্দ্বিধ। সর্পিল-কুটিলতা এবং আদিম-হিংস্রতা তাঁর স্বভাবজ(আভিজাত্যের সদম্ভ আচরণ তাঁর পারিবারিক পরিবেশের সূত্রে প্রাপ্ত(মোসাহেবি-প্রিয়তা এবং 'দাতাকর্ণ' সাজাও তারই আনুষঙ্গিক ব্যাপার। এই সবটুকু মিলিয়েই তাঁর চরিত্রের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞানটুকুর সন্ধান মেলে।

৪২৪

এই রাজাসাহেবের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, এই গল্পের কথকের চরিত্রটি বি(-ষণ করতে গেলে প্রথমেই নজরে পড়ে তাঁর চারিত্রিক দোলাচলতা — যা মধ্যবিত্তের একটা স্বাভাবিক শ্রেণীগত ল(ণ বলা যেতে পারে স্বচ্ছন্দেই। তাঁর স্বার্থবুদ্ধি এবং বিবেকবুদ্ধির মধ্যে যে টানাপোড়েন এই গল্পের মধ্যে দেখি — বিশেষত মূল গল্পের অন্তিম পর্যায়ে, সেটিই হলো মধ্যবিত্তের ঐ শ্রেণীচরিত্রের সার্থক অভিব্যক্তি(।

এই মানুষটি সাধারণ মধ্যবিত্তের এক গড়পড়তা প্রতিনিধি(সংসারী এবং সাহিত্য সংস্কৃতিপ্রেমী। তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা যে খুব একটা স্বচ্ছল নয়, তা তাঁর সমপর্যায়ভুক্ত(বন্ধুদের সম্পর্কে করা একটি মন্তব্যের সূত্রে বোঝা যায় ঃ ''সব কটাকেই তো চিনি, বিনামূল্যে এমন একজোড়া জুতো পাঠাবার মতো দরাজ মেজাজ এবং ট্যাঁক কারো আছে বলেও জানি না।'' এই মধ্যবিত্ততার আবারও একবার অত্যন্ত বি(স্ত প্রমাণ পাওয়া গেল রামগঙ্গা এস্টটে পৌঁছিয়ে স্নান সারার পরে ঃ ''ব্রাকেটে ধোপদুরস্ত ফরাসডাঙ্গার ধুতি, সিল্‌কের লুঙ্গি, আদ্দির পাজামা। দামের দিক থেকে পাজামাটাই সস্তা মনে হল, তাই পরে নিলাম।''

রাজাবাহাদুরের বন্ধুত্ব অর্জনের নামে বস্তুতপ(ে মোসাহেবীই যে করছেন তিনি, সেটাও কিন্তু এই ভদ্রলোক খুব স্বচ্ছভাবেই বোঝেন। তাই ঈ(রগুপ্তীয় ঢঙে রাজস্তুতি তিনি যা লখেছিলেন, সেটাকে তিনি সোনার হাতঘড়ি উপহার (ওরফে ইনাম, বা বকশিস) পাবার পর থেকে যে সম্পূর্ণ সত্য বলেই বি(াস করার চেষ্টা চালাচ্ছেন, সে কথা সবিদ্রূপে নিজেই বলেছেন।

কিন্তু রাজাবাহাদুরের বারো বছর বয়সে বন্দুক চালানোয় রপ্ত হওয়া এবং চৌদ্দ বছরে মদ ধরার ইতিবৃত্ত শুনে তাঁর মনে যে বিরূপতার সঞ্চার ঘটেছে, সেটার অভিব্যক্তি(র (ে ত্রেও তাঁর ব্যঙ্গনৈপুণ্য সমানভাবেই সত্রি(য়ঃ ''রাজারাজড়ার ব্যাপার — সবই অলৌকিক। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কেউটের বাচ্চা। সুতরাং মন্তব্য অনাবশ্যক।''

রাজকীয়-সুখভোগ এবং মোসাহেবী — এদুটো যে প্রকৃতপ(ে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে মানানসই নয়, সেটাও পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয় না, যখন তিনি স্বর্গতোক্তি(করেন ঃ ''পরের পয়সার রাজভোগ খেয়ে এবং রাজোচিত বি(াস করে বেশি দিন কাটানো আর সম্ভব নয় আমার প(ে। রাজাবাহাদুরের অনুগ্রহ একটা দামী জিনিস বটে, কিন্তু কলকাতায় আমার ঘর-সংসার আছে(একটা দায়িত্ব আছে তার। সুতরাং ....''

আর, ঠিক এই মধ্যবিত্তসুলভ বিবেকবৃত্তির লব্ধফল হিসেবেই তিনি রাজাবাহাদুরের অকল্পনীয় 'টোপ'টা যে আসলে কী, সেটা উপলব্ধি করে চিৎকার করে উঠেছিলেন এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই 'রাজা' এবং 'মধ্যবিত্তের' শ্রেণীগত বিপ্রতীপতাটুকু প্রকট হয়ে উঠল — যখন রাজাবাহাদুর সমস্ত ভব্যতার, সৌজন্য-শালীনতার মুখোশটা সরিয়ে ফেলে তাঁকে থামানোর জন্য বুকে রাইফেলের নলটা চেপে ধরলেন।

বলা যায়, ঐ ইস্পাতের শীতল আয়ুধ-স্পর্শেই গল্প কথকের কাছে নিজের শ্রেণীগত অবস্থানটা সুস্থিত হয়ে উঠল। ঘটনা-পরম্পরায় এই ভয়ঙ্কর পরিপ্রে(িতে তাঁর ঘোর গেল কেটে — যা শেষ পরিণামে সব মধ্যবিত্ত মানুষেরই কাটে, কাটতে বাধ্য হয়। কলকাতায় ফিরে আসার পরবর্তী আটমাসে তাঁর এবং এন. আর. চৌধুরী ওরফে রাজাবাহাদুরের মধ্যে আর কোনো যোগাযোগ থাকে না অত্যন্ত সহজবোধ্য কারণেই। বাংলা লোকপ্রবাদ ''বড়র পিরিতি বালির বাঁধ, (ণে হাতে দড়ি (ণেকে চাঁদ'' প্রায় হাতে হাতেই সত্য বলে প্রতীত হলো। রাজাবাহাদুরের আপাত-সম্ভ্রান্ত আভিজাত্যের অন্তরালে যে নিষ্ঠুর দানবীয়তা লুকিয়ে ছিল, সেটা অনাবৃত হয়ে পড়ার পর গল্প কথকের মধ্যেও মোসাহেবীর প্রবণতাটুকু হটে গিয়ে প্রবলতর হয়ে উঠল তাঁর বিবেকবুদ্ধিই(তাই আটমাস তিনি আর কোনো সম্পর্ক রাখেননি রাজাবাহাদুরের সঙ্গে। আটমাস পরে ডাকযোগে বাঘের চামড়ার ঐ মনোরম এবং মহার্ঘ চটি জোড়া যখন এসে পৌঁছয় তাঁর কাছে তখন কিন্তু একই সঙ্গে আবার মধ্যবিত্তের আপোষকামী এবং প্রতিবাদী দুটি সত্তাই তাঁর মধ্যে ত্রি(য়াশীল হয়ে উঠেছে ঃ ''কীপারের একটা বেওয়ারিশ ছেলে যদি জঙ্গলে হরিয়ে গিয়ে থাকে, তা অস্বাভাবিক নয়, তাতে কারো (তি নেই। কিন্তু প্রকাণ্ড রয়্যাল বেঙ্গল মেরে ছিলের রাজাবাহাদুর — লোককে ডেকে দেখানোর মতো। ...... তার আটমাস পরে এই চমৎকার চটিজোড়া উপহার এসেছে। আট মাস আগেকার সে রাত্রি এখন স্বপ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু এই চটিজোড়া অত্যন্ত মনোরম বাস্তব। পায়ে দিয়ে একবার হেঁটে দেখলাম, যেমন নরম, তেমনি আরাম!'' ..... একটা অল(্য (কিন্তু অনুভব করা যায় এমন) বিদ্রূপের চোরাস্রোত এই বিবৃতির ছত্রে ছত্রে প্রবাহিত। সে বিদ্রূপ নিজের প্রতি তো অবশ্যই(কিন্তু সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীচরিত্রের উদ্দেশ্যেও তা সমপরিমাণে প্রযুক্ত(। 'মনোরম'' এবং ''আরাম'' প্রদ ঐ চটিজোড়া যেন মধ্যবিত্তের পলায়নপর, আত্মসতর্ক, ভী(শ্রেণীচরিত্রের প্রতিই সবেগে নি(িপ্ত হয়েছে ধিক্কার আর প্রতিবাদের নীরব প্রতীক হিসেবেই। এক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর দ্বারাই।

রামগঙ্গা এস্টেটের এই 'রাজাবাহাদুর' এবং গল্পের কথক ছাড়া, খুব স্বল্প(ণের জন্য কাহিনীর মধ্যে এলেও আরও দুটি চরিত্র এ গল্পের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে, যারা গল্পের এই তির্যক ব্যঞ্জনাময় রূপটিকে সুপ্রকট করে তুলেছে। বাঘ এবং কীপারের ''বেওয়ারিশ'' শিশু — এ গল্পে এদের দুজনের ভূমিকা (ণস্থায়ী বলে আপাতভাবে প্রতীত হলেও, বস্তুত তাদের গু(ত্ব কিন্তু অপরিসীম। সমাজ-মনোবিজ্ঞানীরা তো ঐ হিংস্র বাঘ এবং দরিদ্র শিশুকে দুটি বিশিষ্ট শ্রেণী প্রতীক হিসেবেই বিচার করবেন। শ্রেণীবিভাজিত সমাজব্যবস্থায় চিরটাকালই নিচের তলার অসহায় মানুষেরা টোপ (অথবা, স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে শার্দুলতুল্য হিংস্র ওপরতলার প্রভুদের কাছে। এ গল্পেও সেটাই প্রতীকায়িত হয়েছে বাঘ এবং কীপারের শিশুর মাধ্যমে।

'টোপ' গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চিত্রকল্প রচনার এমন এক কবিতাসুলভ ভাষাশৈলী ব্যবহার করেছেন, যা কথাসাহিত্যে খুব সহজপ্রাপ্য নয়। অথচ এর ফলে এর ঋজু গদ্যধর্ম একটুও (ুণ্ণ হয়নি। বরঞ্চ, গল্পের উদ্দিষ্ট বক্ত(ব্যটি এর ফলে যথেষ্ট ভাবগর্ভ ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয় অনেক সময়েই। এরই পাশাপাশি আবার ব্যঙ্গ-নিপুণ একটি বাগ্‌রীতিও প্রথম ও শেষ দিকে কাহিনীর আস্বাদে বৈচিত্র্য এনেছে।

প্রথমে বরং এর কাব্যধর্মী স্টাইলটিকেই বি(্-ষণ করা যেতে পারে। বেশ কয়েকবার এই বিশেষ শৈলীটি এমনকিছু চিত্রকল্প রচনার সহায়তা করেছে, যা কাহিনীর পরিণতিকে ব্যঞ্জিত করে তুলেছে অল(্যেই। যেমন ঃ

''রাত তখন ক'টা ঠিক জানি না। আরণ্যক পরিবেশ নির্জনতার অভিভূত। বাইরে শুধু তীব্রকণ্ঠ ঝিঁঝির ডাক।

আমার গায়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা হাত পড়েছে কার। সে হাতের স্পর্শে পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে গেল আমার। রাজাবাহাদুর বললেন — সময় হয়েছে চলুন। .... এই গভীর রাত্রে এমন নিঃশব্দ আহ্বান — সবটা মিলিয়ে একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাসের পটভূমি তৈরী হয়েছে যেন। কেমন একটা অস্বস্তি, একটা অনিশ্চিত ভয়ে গা ছমছম করতে লাগল আমার।..... হান্টিং বাংলোটা অন্ধকার। একটা মৃত্যুর শীতলতা ঢেকে রেখেছে তাকে। একটানা ঝিঁঝির ডাক — চারিদিকে অরণ্যে কান্নার শব্দের মতো পত্রমর্মর। গভীর রাত্রিতে জঙ্গলের মধ্যে মোটর থামিয়ে বসে থাকতে আমার ভয় করছিল, আজও ভয় করছে। কিন্তু এ ভয়ের চেহারা আলাদা — এর মধ্যে আর একটা কী যেন মিশে ঠিক বুঝতে পারছি না, অথচ পাও সরতে চাইছে না আমার। মুখের ওপরে একটা টর্চের আলো, রাজাবাহাদুরের হাতের স্পর্শটা বরফের মতো ঠাণ্ডা, ঠোঁটে আঙুল দিয়ে নীরবতার সেই দুর্বোধ্য কুটিল সংকেত।''

এই দীর্ঘ কাব্যধর্মী গদ্যভাষার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কুশলী শিল্পীর দ(তায় স্তব্ধ ভয়াল, শীতল, অন্ধকার এক মৃত্যুর প্রতিভাস তৈরী করেছেন। একটা ভয়ার্ত অস্বস্তি, ইংরেজি করে বললে যাকে বলা যায় "eerie uncanny সৃষ্টি হয়েছে এই বর্ণনার অন্তর্বিলীন উপজীব্য রূপে। মৃত্যুর এই চিত্রকল্পটি কাহিনীর শেষ পরিণামকে পূর্বসংকেতে ব্যঞ্জিত করে দিয়েছে পাঠকের কাছে। যে ভয়াল পরিণতি সমাসন্ন, তার প্রত্য(কোনো ল(ণ নির্দেশ না-করেও শুধুমাত্র এই চিত্রকল্প নির্মিতির মাধ্যমেই তাকে পূর্বসূচিত করে দিয়েছেন নারায়ণবাবু।

এর অল্প পরেই আবার অন্য ধরনের ভাবব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ কাব্যিক ভাষায় কাহিনীর উদ্বর্তন ঃ

''আবার সেই স্তব্ধতার প্রতী(া। মুহূর্ত কাটছে, মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে।.....দিগন্তপ্রসারী হিংস্র অরণ্য ভাঙা-ভাঙা জ্যোৎস্নায় দেখাচ্ছে তরঙ্গিত একটা সমুদ্রের মতো। নিচের নদীটা ঝকঝক করছে, যেন খাপখোলা তলোয়ার। ..... মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কারছে। ...... কান পেতে শুনছি ঝিঁঝির ডাক, দূরে হাতীর গর্জন, শালপাতার মর্মর।.... মিনিট কাটছে, ঘণ্টা কাটছে ..... ত্র(মশ যেন সম্মোহিত হয়ে গেলাম, ত্র(মশ যেন ঘুম এল আমার।''

গল্প কথকের এই ''আচ্ছন্নতা', যেন 'হিপনোটাইজড' হবার মতন একটা অবস্থা সৃষ্টি করেছেন নারায়ণবাবু খুব সচেতনভাবেই, কেননা এরপরেই বিস্ফোরণ ঘটেছে গুলির, তার আচমকা আওয়াজে খানখান হয়ে গেছে সমস্ত আচ্ছন্নতা, সব স্তব্ধতা। আর সেটাই অভীপ্সিত এই কাহিনীর অমন আচম্বিত পরিণাম সূচিত করবার জন্য। অমল ভয়াল পরিণাম চিত্রিত করার প্রয়োজনে।

এই শৈলীদ(তা নারায়ণবাবুর সহজাত। আধুনিক বাঙালি কথাশিল্পীদের মধ্যে এজন্যেই তিনি অন্যদের থেকে পৃথক। কাহিনীর রূপমগুলের জন্যই শুধু ভাষার কা(বিন্যাস যে নয়, এমনই একটা উপলব্ধি তাঁর ছিল বলেই এভাবে ভাষাকে কাহিনীর ভাব-পরিণামের সঙ্গে তিনি সমন্বিত করতে পেয়েছেন।

এই গল্পের একটি মুখ্য প্রবণতা হল মধ্যবিত্তের সদা সতর্ক-আত্মর(ার মানসিকতার জন্য অসহায়

আত্মগ্‌-ানি এবং আত্মধিক্কার। এই ভাবটির সঙ্গে এর বিদ্রুপ-বঙ্কিম ভাষাশৈলীটিও খুব সুন্দরভাবে মানিয়ে গেছে। দুয়েকটি উদাহরণ এখানে বিবেচনা করাই যেতে পারে(যেমন ঃ

ক) ''নিছক কবিতা মেলাবার জন্য যে বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছিলাম, এখন সেগুলোকেই মনপ্রাণ দিয়ে বি(্বাস করতে শু(করেছি।''

খ) ''ব্রাকেটে ধোপদুরস্ত ফরাসডাঙার ধুতি, সিল্কের লুঙ্গি, আদ্দির পাজামা। দামের দিক থেকে পাজামাটাই সস্তা মনে হল, তাই পরে নিলাম।''

গ) ''আটমাস আগেকার সে রাত্রি এখন স্বপ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু এই চটিজোড়া অতি মনোরম বাস্তব। পায়ে দিয়ে একবার হেঁটে দেখলাম, যেমন নরম, তেমনি আরাম।''

ঘ) ''শ্রদ্ধায় আর বিনয়ে আমার মাথা নিচু হয়ে গেল। মুখে কথা জোগাল না, শুধু বেকুবের মতো কৃতার্থের হাসি হাসলাম একগাল।''

ঙ) ''আমার সৌভাগ্য ওদের ঈর্ষা তা, আমি পরোয়া করি না। নৌকো বাঁধতে হলে বড় গাছ দেখেই বাঁধা ভালো। অন্তত ছোট-খাটো ঝড়-ঝাপটার আঘাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ।''

এই ব্যঙ্গনৈপুণ্য গল্পটির শিল্পরূপ একটা বিশেষ মাত্রা নির্দেশ করেছে সন্দেহ নেই। এই বাচনভঙ্গী — আত্মকথনের শৈলীতে যা বিবৃত, এর মাধ্যমেই কিন্তু গল্পের কথকের ব্যক্তি(চরিত্র এবং শ্রেণীচরিত্র — দুটিই সুচিহ্(ত হয়ে উঠেছে।

ফলত, একদিকে ভাষার মাধ্যমে লিরিক কবিতার মতো ছবি গড়ে ওঠা, আর অন্যদিকে তীক্ষ্ম ব্যঙ্গবঙ্কিম বাগভঙ্গীর দ্বারা প্রতিনিয়ত(অত্যন্ত গদ্যময় রূঢ় বাস্তবতার কঠিন জমির ওপরে নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করা এই দুই আপাত বিপ্রতীপতার দ্বান্দ্বিক অভিব্যক্তি(তে এই গল্পের স্টাইল বা ভাষাশৈলী প্রকাশমান হয়েছে।

৪ঃ ৪

সমস্ত আলোচনার পরিশেষে এই কাহিনীর নাম-পরিচিতির বিষয়েও কিছু বলা বাঞ্ছনীয়। একটি জীবন্ত মানবশিশুর টোপ ফেলে বাঘ শিকার করা হলো — শুধুমাত্র এই কারণেই এ গল্পের এমন নামকরণ যে, তা নয়। গূঢ়তর কিছু একটা তাৎপর্যও নিহিত আছে এই নাম দেওয়ার মধ্যে। শুধু যে হিংস্র অরণ্যশার্দুলকে মানব-শিশু টোপ ফেলে শিকার করার ব্যাপারেই এই রাজাবাহাদুরটি পরম পারদর্শী, তা নয়(মধ্যবিত্ত এক বুদ্ধিজীবীকেও 'বন্ধুত্বের' টোপ ফেলে শকার করতে আগ্রহ আছে তাঁর — নিজের মদগর্বী অহংবোধকে তৃপ্ত করার জন্য মোসাহেব 'শিকার' করারও প্রয়োজন আছে এন. আর. চৌধুরী, রাজা অব রামগঙ্গা এস্টেট নামক এই দানবিক মানুষটির। কখনো সোনার হাতঘড়ি, কখনো চায়ের নেমন্তন্ন, কখনো বা বাঘ শিকারের সঙ্গী হবার 'সাদর' আমন্ত্রণ এবং আপ্যায়নে বুঁদ করে রাখার উদ্যম — এ সবও এক ধরনের টোপ যাতে করে নিজের বৈভব এবং প্রতিপত্তি দেখানো এবং একজন শি(ত, মার্জিতবুদ্ধি ভদ্রলোকের আনুগত্য 'শিকার' করে তৃপ্তি লাভ করা যায়। মেগালোম্যানিয়া নামে মনোবি(-ষকরা একটি ব্যাধির কথা বলেন, যার ল(ণ হচ্ছে নিজের অহম্মন্যতাকে সবচেয়ে বেশি গু(ত্ব দিয়ে, সেটাকে চরিতার্থ করার জন্য যে কোনো কাজ করতে দ্বিধা না করা। সে কাজ গর্হিত, অনুচিত, নীতিবি(দ্ধ, অমানবিক, ঘৃণ্য, হাস্যকর, লজ্জাকর — যাই কিছু হোক না কেন। রামগঙ্গা এস্টেটের এই মালিকটিও উচ্চস্ত একজন মেগালোম্যানিয়াক — তাঁর 'ইগো' বা অহংবোধকে তৃপ্ত করার জন্য তিনি যে কোনো 'টো' ফেলে যে কোনো 'শিকার' করতে (বা ধরতে) দ্বিধাহীন। 'টোপ' নামের গূঢ়তম তাৎপর্য এটাই।

৬৭.৭ অনুশীলনী

☐ বিস্তৃত আলোচনামূলক ☐

১) 'টোপ' গল্পের নামকরণ কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ বিচার ক(ন।

২) 'টোপ' গল্পের মধ্যে লেখকের আর্থ-সামাজিক শ্রেণীচেতনা কতখানি সার্থক হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, দেখান।

৩) 'টোপ' গল্পের কথকের মধ্যে মধ্যবিত্তের শ্রেণীচরিত্রল(ণ কতখানি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বলুন।

৪) স্বৈরাচারী একজন অভিজাত ধনী হিসেবে এন. আর. চৌধুরীকে কতখানি সম্ভাব্য একটি বাস্তব চরিত্র হিসেবে গণ্য করতে পারেন।

৫) ব্যঙ্গনৈপুণ্য এবং লিরিকধর্মিতা — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার এই দুটি বৈশিষ্ট্য কীভাবে 'টোপ' গল্পের সমন্বিত হয়েছে, দেখান।

৬) 'টোপ' গল্পের মুখ্য চরিত্র কে, বুঝিয়ে বলুন।

☐ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক ☐

১) 'টোপ' গল্পের কথক রাজাবাহাদুর সম্পর্কে কী কী কাব্যিক বিশেষণ ব্যবহার করেছিলেন?

২) রামগঙ্গা এস্টেটের অতিথিশালার স্নানঘরটি কতখানি সৌখিনতার সা(্য বহন করত?

৩) রাজাবাহাদুরের 'লাউঞ্জ' কীভাবে সাজানো ছিল?

৪) রাজাবাহাদুরের শিকার করার জন্য টোপটি কীভাবে কার্যকরী করা হয়েছিল?

৫) হান্টিং বাংলোর যাবার আগে গল্প কথকের কেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল?

৬) স্টেশন থেকে রামগঙ্গা এস্টেটের 'রাজবাড়ি'-তে যাবার পথে গল্পকথক আরণ্যক পরিবেশটি কেমন দেখেছিলেন, আর কী ভেবেছিলেন?

☐ নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক ☐

১) আকবর বাদশা কাকে ৪ ল(টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন?

২) রাজাবাহাদুরের কী গাড়ি ছিল?

৩) চায়ের টেবিলে কতরকমের ফল ছিল?

৪) হান্টি বাংলোর পিছনের জঙ্গল সম্পর্কে রাজাবাহাদুরের মত কী?

৫) প্রাতরাশের পরিমাণের সঙ্গে কিসের তুলনা করা হয়েছে?

৬) রাজাবাহাদুরের কাজে 'এনার্জি' লাভ করার মানে কী?

৭) মাতাল হয়ে রাজাবাহাদুর তাঁর অতিথিকে কী প্র্ন করেছিলেন?

৮) জঙ্গলের মধ্যে রাজাবাহাদুর কী শিকার করেছিলেন?

৯) হান্টিং বাংলোটা কত উঁচুতে ছিল?

১০) হান্টিং বাংলোর নিচের নদীটাকে কেমন দেখাচ্ছিল?

১১) কীপারের বাচ্চাদের দেখে গল্পকথকের কী মনে হয়েছিল?

১২) জঙ্গল থেকে হায়না মেরে কখন ফেরা হয়েছিল?

৬৭.৮ উত্তরমালা

বিস্তৃত আলোচনামূলক

১) প্রাসঙ্গিক আলোচনার চতুর্থ অংশের সাহায্যে উত্তর ক(ন।

২) প্রাসঙ্গিক আলোচনার দ্বিতীয় অংশ পড়ে উত্তর লিখুন।

৩) প্রাসঙ্গিক আলোচনার দ্বিতীয় অংশ পড়ে উত্তর লিখুন।

৪) প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রথম ও চতুর্থ অংশ ভাল করে পড়ে উত্তর দিন।

৫) প্রাসঙ্গিক আলোচনার তৃতীয় অংশের সাহায্যে উত্তর ক(ন।

৬) আলোচনার প্রথম ও চতুর্থ অংশ অবলম্বনে উত্তর দিন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক

১) গল্পকথক 'টোপ' গল্পে রাজাবাহাদুর সম্পর্কে যে কাব্যিক বিশেষণগুলি ব্যবহার করেছিলেন তার হোল ঃ

ক) 'ত্রিভুব প্রভাকর ওহে প্রভাকর' অর্থাৎ সূর্যের মত সমস্ত ত্রিভুবন তথা স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালকে আলোকদান করেন।

খ) রাজশ্রেষ্ঠ (রাজাবাহাদুর) গুণবান ও মহীয়ান,

গ) রামচন্দ্রের মত তাঁর অতুলনীয় কীর্তি(

ঘ) শত্রুদমনে তিনি তুলনাহীন।

২) রামগঙ্গা এস্টেটের অতিথি শালাটির স্নানঘরে সৌখিনতা রাজকীয় — কলকাতার গ্রান্ড হোটেলের মত। এর ব্রাকেটে তিন-চারখানা সদ্য পাট-ভাঙা নতুন তোয়ালে। তিনটে দামী সোপকেসে তিনরকমের সাবান, র‍্যাকে দামী তেল, লাইমজুস, অতিকায় বাথ টাব-এর ওপরে ঝাঁঝরি — নিচে টিউবওয়েল থেকে পাম্প করে ধারা স্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্রাকেটে ছিল ধোপদুরস্ত ফরাসডাঙার ধুতি, সিল্কের লুঙ্গি আর আদ্দির পাজামা।

৩) রাজা বাহাদুরের লাউঞ্জটি যেন রীতিমত একটা ন্যাচারাল মিউজিয়াম এবং অস্ত্রাগার। নানা আকারের আগ্নেয়াস্ত্র — ছোট বড় নানা রকম গোটা চারেক রাইফেল। খাপে আঁটা একজোড়া রিভলবার। লম্বা নিষ্কলঙ্ক শেফিল্ডের তরোয়াল। মোটা চামড়ার বেল্টে নানা অস্ত্রের পেতলের কার্তুজ। জড়িদার খাপে খানতিনেক নেপালি ভোজালি। দেওয়ালে হরিণের মাথা(ভালুকের মুখ, বাঘের, সাপের গো-সাপের, হরিণের চামড়া। টেবিলে অতিকায় হাতির মাথা দিয়ে সাজান।

৪) দুজন বেয়ারা একটি কপিকলের চাকা ঘুরিয়ে সাদা পুঁটলির মতো একটা জিনিস কপিকলের দড়ির সঙ্গে বেঁধে দ্রুতবেগে নামিয়ে দিয়েছিল। ভাঙা চাঁদ দেখা দিলে তাঁরা দেখলেন যেন জীবন্ত সাদা পুঁটলিটা অল্প অল্প নড়ছে। পরিশেষে টর্চের আলোয় দেখা গেল ডোরাকাটা অতিকায় বাঘ পুঁটলিটার ওপর থাবা দিতেই, রাইফেলের গুলিতে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

৫) আর একবার মূলপাঠ ভাল করে পড়ে উত্তর ক(ন।

৬) আর একবার মূলপাঠ ভাল করে পড়ে উত্তর ক(ন।

নির্দিষ্ট উল্লেখনমূলক

উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন। মূলপাঠ ভাল করে পড়লেই উত্তর করতে পারবেন। একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যরচনা করে উত্তর দেবেন।

৬৭.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাঃ) — *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প ।*

২) ড. বীরেন্দ্র দত্ত — *বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ।*

৩) ড. সুবোধ সেনগুপ্ত (প্রধান সম্পাদক) — *সংসদ বাঙালি চরিত্রাভিধান।*

৪) ড. শিপ্রা দে — *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প।*